



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 87-93

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.508



সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে নারী পরিসর

ব্রজেশ্বর দাস, গবেষক, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ঝাড়খণ্ড, ভারত

Received: 20.09.2026; Accepted: 26.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Soumitra Chattopadhyay, widely acclaimed for his contribution to Bengali cinema and theatre, was also a significant playwright whose dramatic oeuvre reflects his sustained engagement with human subjectivity, social relations, and individual identity. His deep commitment to theatre and the perceived paucity of suitable dramatic texts encouraged him to take up playwriting as an extension of his artistic practice. Despite the demands of a prolific acting career, he continued to write, producing approximately thirty plays published in book form, including original, translated, and adapted works. Even in his translated and adapted plays, his distinctive dramaturgical vision remains evident in the reconfiguration of themes, characters, and dramatic situations. A notable feature of his dramatic writing is the representation of the individual as a self-conscious subject capable of articulating an autonomous sense of self. This becomes particularly significant in his portrayal of women. His extensive experience as an actor, and his close engagement with people across different social locations, enriched his understanding of gendered experiences and social realities. Consequently, women frequently occupy a central and dynamic position in his plays. His female characters negotiate diverse experiences of marriage, family, loneliness, responsibility, rights, protest, freedom, and selfhood. Some resist established social structures, while others suppress personal desires in favour of familial obligations; some embody empathy, whereas others internalize guilt and inadequacy. This paper examines these varied representations of women and explores how Chattopadhyay's dramatic works negotiate the complex relationship between female agency, individual identity, and socially constructed expectations. It seeks to situate his representation of women within the broader context of modern Bengali theatre and gender discourse.

Keywords: Soumitra Chattopadhyay, Bengali Drama, Bengali Theatre, Gender Discourse, freedom

বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে একজন দক্ষ ও বলিষ্ঠ অভিনেতা, কবি, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, আবৃত্তিকাররূপে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অনন্য ব্যক্তিত্ব। থিয়েটার ও সিনেমায় তিনি দীর্ঘদিন দাপটের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। লিখেছেন ত্রিশাধিক নাটক। নাটক, সিনেমার সঙ্গে নিবিড় যোগ এবং সমকালীন সমাজজীবনের প্রতি বাস্তববোধ তাঁর নাট্যভাবনাকে বিশেষ মাত্রা দিয়েছে। নাটকে ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক, অস্তিত্বের সংকট,

মূল্যবোধের পরিবর্তন, রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং মানবিক সম্পর্কের জটিলতার পাশাপাশি নারীজীবনের বিবিধ দিক উঠে এসেছে। তাঁর নারীচরিত্রের মধ্যে যেমন প্রচলিত পারিবারিক ও সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত জীবনের চিত্র রয়েছে, তেমনই রয়েছে আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আকাঙ্ক্ষা, সম্পর্কের টানা পোড়েন এবং সামাজিক বিধিনিষেধের সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার সংঘাত। ফলে তাঁর নাটকে ‘নারী পরিসর’ বলতে শুধুমাত্র নাটকের নারী চরিত্রগুলির উপস্থিতিকে বোঝায় না; বরং নারী কীভাবে পরিবার, প্রেম, দাম্পত্য, সমাজ, রাজনীতি, অর্থনৈতিক বাস্তবতা ও ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে— তার একটি বিস্তৃত নাট্যরূপকে বোঝায়।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সমাজ-রাজনীতিতে ব্যাপক রদবদল ঘটে। রাজনৈতিক অস্থিরতা, নগরায়ণ, শিক্ষার প্রসার, মধ্যবিত্ত জীবনের পরিবর্তন এবং নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে নতুন ভাবনা এই সময়কার সাহিত্যে দেখা যায়। এই পরিবর্তনশীলতার নিরিখে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের নারীদের নিয়ে আলোচনা যেন সময়ের দাবি। তাঁর নাটকে নারী কখনও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কেন্দ্রে, কখনও পারিবারিক সংকটের ধারক, কখনওবা সামাজিক বাস্তবতার সাক্ষী। নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা, এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তার দাবিদার হিসাবে তারা নাটকে উপস্থিত। এই বহুমাত্রিকতায় নির্মিত হয়েছে সৌমিত্রের নাটকের নারী পরিসর। এই দিকটির আলোচনায় ‘নারী’কে শ্রেণি, পরিবার, সম্পর্ক, সামাজিক অবস্থান, মানসিক দ্বন্দ্ব এবং ব্যক্তিস্বাধীনতার মত বিভিন্ন উপাদানের আন্তঃসম্পর্কে বিচার করা আবশ্যিক। বিশেষত পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক কাঠামোয় নারীর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশের অধিকার, ভালোবাসা ও দাম্পত্য সম্পর্কে অবস্থান এবং নিজের পরিচয় নির্মাণের প্রয়াস তাঁর নাটকের নারীচরিত্র বিশ্লেষণের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হতে পারে। আরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে নারী-পুরুষ সম্পর্কে শুধুমাত্র প্রেম বা দাম্পত্যের সীমারেখায় দেখা যায় না। ব্যক্তি ও ব্যক্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে বৃহত্তর সামাজিক বাস্তবতা এবং ক্ষমতার কাঠামোও প্রকাশিত হয়। ফলে তাঁর নাটকের নারীপরিসর বিশ্লেষণ করলে একদিকে যেমন নারীর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক জগতের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই সমকালীন সমাজের মূল্যবোধ, পারিবারিক কাঠামো এবং লিঙ্গসম্পর্কের পরিবর্তনশীল রূপও অনুধাবন করা সম্ভব। এই প্রেক্ষিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা নাটকে নারী পরিসর নিয়ে আলোচনা কেবল কয়েকটি নারীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। বরং তাঁর নাট্যরচনায় নারী-উপস্থিতির প্রকৃতি, নারীচরিত্রের আত্মপরিচয়, দাম্পত্য ও প্রেমের সম্পর্ক, পারিবারিক পরিসরে নারীর অবস্থান, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ও ব্যক্তিস্বাধীনতার দ্বন্দ্ব এবং সমকালীন সমাজবাস্তবতার সঙ্গে নারীর সম্পর্ক— এই সমস্ত বিষয়কে সমন্বিতভাবে বিশ্লেষণ করা হবে। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাট্যসাহিত্যে নারীর অবস্থান ও তাৎপর্য যেমন স্পষ্ট হবে, তেমনই বাংলা নাটকে নারী-অভিজ্ঞতার বিবর্তন সম্পর্কেও একটি গুরুত্বপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণের সুযোগ তৈরি হবে।

২

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকের নারীরা দয়াময়ী, স্নেহময়ী পাশাপাশি প্রতিবাদীও বটে। সেখানে যেমন উচ্চবিত্ত নারীরা আছে তেমনই আছে নিম্নবিত্ত, দরিদ্র নারীরা। শিক্ষিত নারীর পাশাপাশি অক্ষর জ্ঞানহীন নারীরাও আছে। এক কথায় নারী পরিসর তিনি তাঁর নাটকে দিয়েছেন। সহায় সম্বলহীন নারীর সামাজিক অবস্থান কেমন হয় তার দৃষ্টান্ত রয়েছে ‘বিধি ও ব্যতিক্রম’, ‘ভুল’, ‘সেরিবা-সেরিবান’ নাটকে। সমাজ সবসময় দুর্বলের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করে। আর সেই দুর্বল মানুষটি যদি নারী হয় তবে তো আর কোন কথায় নেই। সমাজের সঙ্গে বিচার ব্যবস্থাও কীভাবে একজন সহায় সম্বলহীন নারীকে দুঃখের সাগরে নিমজ্জিত করে

তাঁর যথাযথ বিষয়টি তুলে ধরেছেন 'বিধি ও ব্যতিক্রম' নাটকে। নাটকের কুলি নিজের পেশাদারিত্ব ও সাংসারিক দায়বদ্ধতায় উচ্চবিত্ত গণেশপ্রসাদের শত লাঞ্ছনা সহ্য করেও নিজের কাজ করে যায়। কিন্তু পুরস্কার স্বরূপ মনিবের হাতে তাঁর জীবনটাই দিতে হয়। জীবন গেলে তাঁর পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। তখন অসহায় অবস্থায় ন্যায় বিচার প্রার্থনা করে কুলির স্ত্রী। কিন্তু উচ্চবিত্তদের ষড়যন্ত্রে সেখানেও সে বিচার পায় না। উল্টে তার স্বামীর পেশাদারিত্ব সং মানসিকতাকে প্রশ্নচিহ্নের মধ্যে এনে তাকে অপমান করা হয়। তখন কুলির বিধবা স্ত্রী নিজের স্বামীর প্রতি বিশ্বাস নিয়েই বলে ওঠে -

“ধর্মান্বিতার, আমি একটা কথা বলতে চাই। সে ওঁকে কিছুতেই মারতে পারে না- সে তো কই কখনও কাউকে মারেনি।”^১

কুলির স্ত্রীর স্বামীর প্রতি যতটা বিশ্বাস ছিল তার থেকেও বেশি পরিমাণে অবিশ্বাস জন্ম নেয় বিচার ব্যবস্থার ওপর। সমাজের রক্তচক্ষু যে কেবল দুর্বলের উপর তা আবারও প্রমাণিত হয়। আর এও প্রমাণিত হয় স্ত্রীর স্বামীর প্রতি বিশ্বাস। যে বিশ্বাস মানুষকে একাত্ম করতে সাহায্য করে। কেননা বিশ্বাসই পারে মানুষের মানসিক আশ্রয়কে উন্নত করতে।

'ভুল' নাটকে নারীর দ্বারা বিশ্বাসভঙ্গ দেখা যায়। যে নারী স্বামীর প্রতি বিশ্বাসী সেই নারী এখানে একেবারে উল্টো পথের মানুষ। শুধুমাত্র নিজেদের জীবনকে বাঁচিয়ে রাখতে তারা আশ্রিত মানুষদের সর্বস্ব কেড়ে নিয়ে তাদেরকে হত্যা করে। মানবিকশূন্য এইসব মানুষের কাছে টাকা-পয়সাই সব। মানুষকে মানুষের বন্ধু মনে করায় তাদের ঘোর আপত্তি -

“... যে দুটি মহিলা আপনাকে হোটেলের এই ঘরটি ভাড়া দিয়েছে তাদের লাভ-অলাভের মধ্যে আপনাকে বন্ধু বলে ভাবার কোনও দায় নেই- তা হলে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ হয়ে আসবে।”^২

নাটকে মানুষের প্রতি বিশ্বাস না থাকলেও রয়েছে পুরুষ মানুষের প্রতি এক অকৃত্রিম ভালোলাগা। মার্খা যৌবনপ্রাপ্তা নারী। মনের এক কোণে সংসার বাঁধার স্বপ্ন জমা আছে। আগত পুরুষ মানুষের কাছে তাদের দেশের গল্প শুনে সেখানে গিয়ে সুখী হবার বাসনা প্রকাশ করে। নারী মনের একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনায় সে মানুষকে খুন করার মত জঘন্যতম কাজ করে -

“মার্খা: ... কিন্তু এই সংকীর্ণ আকাশের তলায় তিল তিল করে মরতে মরতে আমিও ক্লান্ত।

... কিন্তু আমার বুকের মধ্যে কুড়ি বছর বয়সের সেই কতকগুলো অবুঝ বাসনা এখনও ছটফট করে। সেগুলো যাতে চিরকালের মতো শান্ত হয়ে যায় আমি সেই ব্যবস্থা করতে চাই।”^৩

'সেরিবা-সেরিবান' নাটকে উৎপলা ও তার দিদিমা অসহায়। দিদিমা নিজের জীবিত অবস্থায় সন্তান, সন্তানের স্ত্রীর মৃত্যু তাঁকে শোকগ্রস্ত করে তুলেছে। বাঁচার আশা পেয়েছেন একমাত্র নাতনি উৎপলাকে আশ্রয় করে। কিন্তু অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ হওয়ায় সেখানেও হতাশ হয়েছেন। নাতনির শখ পূরণ করতে না পেরে নিজেকে দায়ী করতে চেয়েছেন। নাতনির জন্য নিজেকে বিনয়ী করেছে। বাঁধা পড়েছে সম্পর্কের বাঁধনে। নাতনির জন্য তিনি নিজের বাড়িতে আগত ফেরিওয়ালাদের কাছে জিনিস কিনতে যাওয়ার আগে বিনয়ীভাবে তার অবস্থার কথা জানিয়েছেন - “দিদিমা : আমরা গরিব মানুষ বাপু...”^৪ অর্থ সমাজে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। তাকে সমান্তরাল শ্রেণিতে বসার সুযোগ দেয়। কথা বলার সাহস জোগায়। তাই অর্থ উপার্জনের দিকে মানুষের ঝোঁক। নারী সেজন্য অর্থ উপার্জনে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। নিজের অবস্থার উন্নতিতে তাই তারা অংশগ্রহণ করেছে উপার্জনের ক্ষেত্রে। নিজের চাওয়া পাওয়াকে সম্মান জানাতে, তার

সঙ্গে নিজের বিরুদ্ধে ঘটয়াওয়া যাবতীয় অপমানকে ফেরত দিতে নারীকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে হয়েছে। নারীর এই স্বাবলম্বী হওয়ার মানসিকতা 'নামজীবন', 'ফেরা', 'টাইপিস্ট', নাটকের নারীদের মধ্যে দেখা গেছে। 'নামজীবন'- এর বাণী পিতামাতাহীন একাকী নারী। সে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে কারখানাতে কাজ নিয়েছে। নিজের অম্মের জন্য কারও মুখাপেক্ষী হতে চায়নি। এমনকি নিজের ভালোবাসার মানুষ বিশ্বের কাছেও নয়। নিজের আত্মসম্মান সবার আগে। তার সম্বন্ধে দাগ লাগুক এমন কোন কাজ সে করেনি। তার মান-সম্বন্ধ নিয়ে কেউ প্রশ্ন তুললে তাকে ত্যাগ করতে একবার ভাবেনি। সে যতই তার কাছের মানুষ হোক না কেন তাতে তার কিছু যায় আসে না। আবার তার সম্বন্ধে দাগ লাগাতে আসা মানুষদেরও সে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে -

“বাণী: একবার মাথা হেঁট করলে সারা জীবনটাই মাথা হেঁট করে থাকতে হবে বাসনাদি... পুরুষমানুষকে আমার জানা হয়ে গিয়েছে। এখন আর কোনও কিছুই আমি পরোয়া করি না।”^৫

নাটকের অন্য আরেকজন নারী বাসনা নিজের সংসারের অবস্থার উন্নতির জন্য সেলাইয়ের কাজে নিজেকে নিযুক্ত করেছে। সন্তানদের ভালোভাবে মানুষ করার জন্য তাঁর এই কাজ করা।

'ফেরা' নাটকের প্রতিমা সিংহ অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হয়ে নিজেকে প্রস্তুত করেছে তার প্রতি হওয়া অন্যায় ও অপমানের বদলার জন্য। প্রতিমা সিংহ ভালোবেসে ছিল গ্রামের প্রভাবশালী কাশীনাথকে। কাশীনাথ তাকে স্বপ্ন দেখিয়ে তার সঙ্গে মেলামেশা করেছে। কিন্তু সে তার ভালোবাসাকে মর্যাদা দেয়নি। উপরন্তু তাকে অপবাদ দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছিল। অপমান সহ্য করে প্রতিমা সিংহ গ্রাম ত্যাগ করেছিল। মনে মনে এও শপথ করেছিল কোন একদিন তার সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের প্রতিবাদ নিজেই করবে। তার এই শপথ পূর্ণ হয়েছে। নিজেকে শক্তিমান করে গ্রামে ফিরে এসেছে। যে গ্রামের মানুষেরা একদা তার বিরুদ্ধে গিয়ে তাকে গ্রাম ছাড়তে কাশীনাথকে সহযোগিতা করেছিল তারাই আজ প্রতিমা সিংহের অর্থের কাছে বশত্যা স্বীকার করেছে। কাশীনাথের হত্যাকারী হতে প্রস্তুত হয়েছে। প্রতিমা তার সঙ্গে ঘটা সব মনে রেখে প্রতিবাদী হয়েছে। স্মৃতিপটে সমস্ত কিছু আজ জ্বলজ্বল করছে। তার কণ্ঠে প্রতিবাদের সুর শোনা যায় -

“... আমিও একটি কথাও ভুলে যায়নি কাশীনাথদা। কনকদুর্গার বনের কথা ভুলিনি, খামারবাড়ির কথা ভুলিনি, বাসিনী বাগদিনির ঘরের কথা যেমন ভুলিনি, তোমার বিশ্বাসঘাতকতাও আমি ভুলিনি... এখন আমি আমাদের মধ্যকার পাওনাগন্ডাটা কড়ায় ক্রান্তিতে মিটিয়ে ফেলতে চাই।”^৬

একজন নারী নিজের দায়িত্ববোধে কর্মে নিযুক্ত হয়ে অর্থ উপার্জন করেছে 'টাইপিস্ট' নাটকে। এই নাটকের ইন্দ্রাণী একটি অফিসে কর্মরত। তাঁর কাজ টাইপ করা। সাংসারিক দায়িত্বে নিজেকে নিযুক্ত না করলেও মায়ের প্রতি তার দায়িত্ববোধ ছিল। নিজের জীবনের ভালো লাগাকে বিসর্জন দিতে হয়েছে দায়িত্ববোধের জন্য। নারী মন ভালোবাসা চায়। এই সহজাত প্রবৃত্তি ইন্দ্রাণীর মধ্যেও ছিল। কিন্তু কর্তব্যের করাল গ্রাসে তার এই প্রবৃত্তি শেষ হয়ে গেছে। এখানে ইন্দ্রাণী অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হলেও নারী হিসেবে সে থেকে গেছে আড়ালে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নারী যে বরাবর নিজেই করেছে তা কিন্তু নয়। এমন অনেক নারীরা আছে যারা অর্থনৈতিক নিরাপত্তায় নিজেকে অন্যের ওপর সঁপে দিয়েছে। 'হালদারগোষ্ঠী'র কিরণ ও 'ঘটক বিদায়' নাটকের মলয়া এমন নারী। মলয়া নিজের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য বয়স্ক দামোদর সিংহকে বিয়ে করতে প্রস্তুত হয়েছে। তাঁর কথায়- “...শুনে রাখ আমি ওঁকে ভালবাসি না। কিন্তু...”^৭ ভালো না বেসেও শুধুমাত্র

নিজের বর্তমান অবস্থা থেকে মুক্ত হতে সে বিয়েতে রাজি হয়েছে। অন্যদিকে 'হালদার গোষ্ঠী'র কিরণ হালদার পরিবারের অনুগ্রহ নিয়েছে তার সন্তান না হওয়ার জন্য। নিজেকে অপরাধী মনে করে পরিবারের অর্থনৈতিক অবস্থায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটকে এমন অনেক নারী আছে যারা অর্থের থেকেও বেশি পরিমাণে দাবি করে ভালোবাসার, অনুগ্রহের। অর্থের বাইরে বেরিয়ে এসে তারা মানসিকভাবে দৃঢ় হতে চেয়েছে। যে নির্ভরতা নারীকে পুরুষের সঙ্গে একাত্ম করে। কিন্তু প্রতিক্ষেত্রেই নারী ব্যর্থ হয়েছে। ফলে স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষের প্রতি নারীর আকর্ষণ বেড়েছে। 'নীলকণ্ঠ' নাটকের অলকার স্বামী পুণ্যশ্লোক বেশিরভাগ সময় বাড়ির বাইরে থেকেছে। অন্য নারীতে আসক্ত হয়েছে। অলকার মনকে বোঝার চেষ্টা করেনি। তাই অলকাকে বাধ্য হয়ে ভালোবাসার প্রয়োজনে বিকল্প ভাবনা করতে হয়েছে। তাই নীলকণ্ঠের কাছে মানসিক শান্তি পেয়ে সেখানে সে ভালোবাসা উজাড় করে দিয়েছে। তার ফলস্বরূপ রমা হয়েছে অলকা নীলকণ্ঠের সন্তান। মানসিক শান্তি পেতে চেয়েছে নারী। তবে সব ক্ষেত্রেই যে এই নারীরা অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হয়ে নিজেকে তাঁর প্রতি সপে দিয়েছে এমন নয়। 'পয়লা নম্বর' নাটকের অনিলা নিজের স্বামীর প্রতি অভিযোগ করেছে। স্বামীর অতিরিক্ত জ্ঞানচর্চা তার ভালো লাগেনি। জীবন সম্পর্কে স্বামীর এইরকম উদাসীনতায় পয়লা নম্বরের সীতাংশু মৌলির প্রতি ঝুঁকেও সে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। পুরুষের প্রতি অনুযোগ নিয়ে সে দুজনকেই ছেড়ে এসেছে।

সৌমিত্রের নাটকের নারীরা প্রতিবাদী ও সহমর্মী। 'বোষ্টমী' নাটকের বোষ্টমী নিজের সঙ্গে ঘটা অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। আবার এমন নারীরা আছে যারা অন্যের দুঃখে দুঃখী হয়েছে। 'মহাসিঙ্কুর ওপার হতে' নাটকের পারুলবালা, 'জন্মান্তর' নাটকের নীলিমা, 'বৃহন্নলা' নাটকের মিনতিরা প্রত্যেকেই নিজেদের ভালো দিক দিয়ে অন্যের ভালো করার চেষ্টা করেছে। এর পাশাপাশি তাঁর নাটকে এমন নারীরা আছে যারা পুরুষের ভালোবাসা একেবারেই পায়নি। কেউ দায়িত্বের করাল গ্রাসে নিমজ্জিত হওয়ায়, কেউবা পিতা ও মাতার অজ্ঞতার জন্য ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। সমাজে অনেক নারী আছে যারা নিজের স্বপ্নপূরণের জন্য অপরাধ জগতে পা রাখে। 'আরোহন' নাটকের মধুমিতা এমন একজন নারী। যে কিনা নিজের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে স্বামীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয়। সে ভাইদের ব্যবসার অংশীদার হতে চেয়েছে। কিন্তু ভাইয়েরা তাকে প্রথমে সেই ব্যবসায়ের অংশীদার করতে সমর্থন জানালেও পরে তারা তাকে বাদ দিয়েই ব্যবসা শুরু করতে চেয়েছে। ফলে তার রাগ দ্বিগুণ হয়েছে। এমনকি স্বামীর কাছে ব্যবসায়ের টাকা না পেয়ে সে আরও উন্মাদ হয়েছে। পালিতকন্যাকে দিয়ে স্বামীকে বাড়ি এনেছে। স্বামীর সাথে ভালো ব্যবহার করেছে। কিন্তু যখন স্বামী টাকা দিতে অস্বীকার করেছে তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। যাতে করে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে। সে ফাটল স্বামী অমিতাভ দূর করতে চেয়েছে। কিন্তু সে ব্যর্থ হয়েছে। মধুমিতার জেদ তাকে সে কাজ করতে দেয়নি। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্যে বসবাস করার স্বপ্নে মশগুল হয়ে মধুমিতা স্বামীর সাথে দূরত্ব তৈরি করে গেছে। এমনকি উপায় না দেখে স্বামীকে হত্যার মতো জঘন্য কাজ করেছে। তাঁর কাছে আত্মসুখ বড় হয়েছে।

নিজেকে পরিপাটি রাখতে ভালোবাসে নারী। তার সৌন্দর্যের প্রশংসা সে প্রত্যাশা করে। অন্যের কাছে নিজের সুনাম নারীকে গর্বিত করে। অন্য নারীর সঙ্গে তুলনায় এগিয়ে গেলে নারীর গর্বের সীমা থাকে না। সে সবসময় নিজেকে সৌন্দর্যের চাদরে জড়িয়ে রাখতে ভালোবাসে। এমন নারীও সৌমিত্রের নাটকে ধরা দিয়েছে। তাঁর 'উত্তর পৌরাণিক' নাটকের শৈলজা এই ধরনের নারী। যে অন্ধ। অন্যের মুখে নিজের সৌন্দর্যের কথা শুনে মনে মনে খুশি হয়। তার এই সৌন্দর্য নিজে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করে। নিজের

ভালোবাসার মানুষকে দেখতে চায়। সে মনে মনে নিজের ও তার ভালোবাসার মানুষটি কেমন হবে তার কল্পনাও করে। দৈবাৎ সে দৃষ্টিশক্তি পায়। কিন্তু তার কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের সৌন্দর্যের কোন মিল হয় না। ফলত সে তার প্রিয় মানুষটিকে ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে তার জ্ঞানচক্ষু খুলে যায়। সে উপলব্ধি করতে পারে বাহ্যিক সৌন্দর্য শুধুমাত্র ক্ষণিকের ভালোলাগা। কিন্তু অন্তরের সৌন্দর্য চিরস্থায়ী। ফলে সে আবারও ঈশ্বরের কাছে দৃষ্টিশক্তি চলে যাওয়ার অনুরোধ জানায়। দৃষ্টি গেলে সে ভালোবাসার মানুষের কাছে আবার ফিরে আসে। তার উপলব্ধি দিয়ে সে ভালোবাসার মানুষকে চিরজীবনের জন্য সাথে রাখার অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সে বোঝে সৌন্দর্যের মূল্য।

নারী আন্দোলনে জড়িয়েছে বারংবার। নিজের জন্য আন্দোলন করেছে। সমাজের জন্য করেছে। দেশের জন্য করেছে। আন্দোলনে নারীর অলসতা নেই। বারংবার সে তার প্রমাণ দিয়েছে। পুরুষকে পাশে পেয়ে আন্দোলন করেছে। পুরুষকে না পেয়েও আন্দোলন করেছে। সমাজকে বাঁচাতে আন্দোলনরত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতেও নারী দুবার ভাবেনি— এমনই এক নারীর কাহিনি 'বৃহন্নলা' নাটক। এনাটকের মিনতি লড়াকু মেয়ে। নিজের জীবন সংগ্রামে একাকী। আন্দোলনে অকুতোভয়। নিজের ভাইকে সামনে থেকে আন্দোলনে মৃত্যুবরণ করতে দেখে সে আরও বেশি সাহসী। নকশাল আন্দোলনে ভাইকে জীবন দিতে হয়েছে। তাই তার ভাড়া বাড়ির পাশের ঘরে বিষ্ণুর বন্ধু ধীরেনের সম্বন্ধে নকশাল আন্দোলনের যুক্ত থাকার কথা লোকমুখে শুনে সে বিশ্বাস করেছে। যদিও ধীরেন একজন উঠতি কবি। কোনরকম নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে সে যুক্ত নয়। জীবন সংগ্রামে সংগ্রাম করে চলেছে। নিজের বেঁচে থাকার অম্লটুকুর জন্য যে অন্যের উপর নির্ভরশীল তাকেও মিনতি বাঁচাতে চেয়েছে। বিষ্ণুর ঘরে খোকনের রেখে যাওয়া বোমা নিজের বলে বিষ্ণু, ধীরেন সকলকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। সে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছে। আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত সকলকে বাঁচাতে তার এই মৃত্যুবরণ। এই মৃত্যু পুরুষশাসিত সমাজের চোখে আগুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় আন্দোলনের জন্য নারীকে পিছনের সারিতে রাখা ঠিক নয়। তাকে পাশে রেখে সংগ্রামী পুরুষের এগিয়ে যাওয়া উচিত।

'আরোহন' নাটকের ছায়া পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাছে নিষ্পেষিত। স্বামী শ্যামাদাস ঘোষের ছায়াসঙ্গী হতে পারিনি ছায়া। তাকে স্বাধীনভাবে কখনই বলতে দেওয়া হয়নি। সব সময় দাবিয়ে রাখা হয়েছে। তাকে প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয়নি। বাড়িতে আগত অনাবাসী ভারতীয় সুবীর দাশগুপ্তের সাথে ছায়ার কথা বলা শ্যামাদাসের ভালো লাগেনি। সহজ সরল নারী মন নিয়ে ছায়া সুবীরের সাথে কথা বলেছে। দয়া, মায়া, মমতা তার মধ্যে ছিল। কিন্তু নিজের নিরাপত্তার খাতিরে সে তা প্রকাশ করতে গিয়েও করতে পারেনি। কেমন একটা অসহায়ত্ব তার মধ্যে কাজ করেছে।

৩

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নাটক বিশ্লেষণ করলে স্পষ্ট হয় যে, তাঁর নাটকে নারী কেবল কাহিনির আনুষঙ্গিক চরিত্র নয়; বরং ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কে অনুধাবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। তাঁর নাট্যজগতে নারীজীবনের ব্যক্তিগত অনুভব, প্রেম, দাম্পত্য, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, আত্মপরিচয়ের সংকট এবং স্বাধীন সত্তার আকাঙ্ক্ষা নানা মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। ফলে তাঁর নাটকে নির্মিত 'নারী পরিসর' একই সঙ্গে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক— অন্তর্জগতের অনুভূতি যেমন এখানে গুরুত্বপূর্ণ, তেমনই বৃহত্তর সমাজবাস্তবতার অভিঘাতও তাৎপর্যপূর্ণ।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নারীচরিত্রগুলি বহুমাত্রিকতা। তারা একদিকে প্রচলিত সামাজিক ও পারিবারিক কাঠামোর মধ্যে অবস্থান করে, অন্যদিকে সেই কাঠামোর সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতনও হয়ে ওঠে। প্রেম ও পর্ব-৩, সংখ্যা-১, সেপ্টেম্বর, ২০২৬

দাম্পত্যের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে নারীর আবেগ, প্রত্যাশা, বঞ্চনা এবং আত্মমর্যাদার প্রশ্ন যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই ব্যক্তিসত্তা ও সামাজিক প্রত্যাশার সংঘাতও সামনে আসে। এই সংঘাত নারীর চরিত্রকে একমাত্রিক না করে তাকে জটিল ও মানবিক করে তোলে। তাঁর নাটকে নারীকে শুধুমাত্র ‘নির্যাতিত’ বা ‘অসহায়’ সত্তা হিসেবে দেখার প্রবণতা সর্বত্র প্রাধান্য পায় না। বরং নারী চরিত্রের চিন্তা, অনুভব, সিদ্ধান্ত, সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি এবং আত্মপরিচয়ের আকাঙ্ক্ষা তাকে একটি স্বতন্ত্র মানবিক সত্তা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলে নারীর সামাজিক অবস্থানকে কেবল বাহ্যিক পরিস্থিতির নিরিখে নয়, তার মানসিক ও অস্তিত্বগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েও উপলব্ধি করা সম্ভব হয়।

সৌমিত্রের নাট্যভাবনার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্য দিয়ে ক্ষমতা, সামাজিক মূল্যবোধ এবং পারিবারিক কাঠামোর অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বকে উন্মোচিত করা। তাঁর নাটকের সম্পর্কগুলি নিছক ব্যক্তিগত সম্পর্ক নয়; সেগুলির মধ্যে সমকালীন মধ্যবিত্ত সমাজের মানসিকতা, নৈতিক দ্বিধা, সামাজিক প্রত্যাশা এবং পরিবর্তনশীল মূল্যবোধের প্রতিফলন রয়েছে। এই কারণে তাঁর নাটকে নারীপরিসর বিশ্লেষণ করলে একই সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট সময়ের সমাজমানসকেও পাঠ করা যায়। তবে তাঁর নারীচরিত্রকে সমকালীন নারীবাদী ধারণার সরল প্রতিরূপ হিসেবে চিহ্নিত না করে, তাঁর নিজস্ব সময়, সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত এবং নাট্যভাষার মধ্যে রেখে বিচার করা অধিক যুক্তিসংগত। কারণ তাঁর নাটকে নারীর স্বাধীনতার প্রশ্ন যেমন উপস্থিত, তেমনই রয়েছে সম্পর্ক, পরিবার এবং সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে তার জটিল সমঝোতা। এই দ্বৈততা তাঁর নারীচরিত্রকে বাস্তবসম্মত করে এবং নারীজীবনের অভিজ্ঞতাকে একটি নির্দিষ্ট মতাদর্শের সীমায় আবদ্ধ না রেখে বহুমাত্রিক করে তোলে। অতএব, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা নাটকে ‘নারী পরিসর’ মূলত নারীজীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতার একটি নাট্যরূপ। তাঁর নাটকের নারী কখনও প্রেমের মানুষ, কখনও পরিবারের সদস্য, কখনও সামাজিক কাঠামোর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ব্যক্তি, আবার কখনও নিজের অস্তিত্ব ও পরিচয়ের সন্ধানী স্বতন্ত্র সত্তা। এই বহুমাত্রিক নারী-উপস্থিতি তাঁর নাট্যসাহিত্যকে শুধু মানবসম্পর্কের নাট্যায়ন হিসেবে নয়, সমকালীন সমাজ ও ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক সম্পর্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ দলিল হিসেবেও বিবেচনার সুযোগ করে দেয়। বাংলা নাটকের পরিসরে তাই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের নারীচিন্তা ও নারীচরিত্রের পুনর্মূল্যায়ন তাঁর সামগ্রিক নাট্যসৃষ্টির অন্তর্নিহিত মানবতাবাদী ও সমাজমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গি বোঝার ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্য বহন করে।

তথ্যসূত্র:

১. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ১। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩০।
২. তদেব, পৃ. ৫০।
৩. তদেব। পৃ. ৫৬।
৪. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ২। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৭।
৫. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ১। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৪২।
৬. তদেব, পৃ. ৪২৭।
৭. চট্টোপাধ্যায়, সৌমিত্র। নাটক সমগ্র ২। কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৩৪।